শমীক

বিমল কর

গ্রন্থতীর্থ
৬৫/৩এ, কলেজস্ট্রিট
কলকাতা-৭০০ ০৭৩

শমীক বলত, সে ক্ষণজন্মা পুরুষ। ক্ষণজন্মা শব্দটার সে যা অর্থ করত তাতে বন্ধুরা চমৎকৃত না হয়ে পারত না। মনে মনে ভাবত, শমীককে অভিধান সংশোধনের কাজে লাগালে বাংলা ভাষার সর্বনাশ হয়ে যাবে।

শমীক বলত, তার জন্মই সর্বনাশের মধ্যে। সাতচল্লিশ সালের আগস্ট মাসে সে জন্মেছিল। তার জন্মমুহূর্তে শহর কলকাতার ঘরে ঘরে শাঁক বাজছিল সরবে। শমীককে অভ্যর্থনা করতে চতুর্দিকে এত শঙ্খধ্বনি, কাঁসর-বাদ্যের ঘটা হবে—এটা মনে করা ভুল। পনেরোই আগস্টের সেই প্রবল উচ্ছ্বাসের মধ্যে শমীক কেমন করে জন্মে গেল এটা বিধাতাই বলতে পারেন। শমীক নিজে অবশ্য বলে, বিধাতা অত কাঁচা হাতের মানুষ নন, জেনেশুনেই শমীককে যথাসময়ে পাঠিয়েছিলেন। তার জন্ম—সিম্বলিক।

বিধাতা শমীককে নিয়ে আরও কিছু কিছু রহস্য করেছিলেন। মাতৃগর্ভ থেকেই সে এক মর্মান্তিক বন্ধন নিয়ে ভূমিষ্ঠ হয়েছিল। নাড়িটা কেমন করে যেন শেষ সময়ে তার গলার কাছে জড়িয়ে যায়। জলজ শ্যাওলার মতন নীলাভ রঙ হয়ে গিয়েছিল তার, তেমনই নিষ্প্রভ, লালাময়। সেই মুহূর্তেই শমীক আবার ভগবানের কাছে ফিরে যেতে পারত। কিন্তু শমীককে যিনি দু হাত দিয়ে ধরে নিয়েছিলেন তিনি অসাধ্য সাধন করলেন। পাঁচ-সাতটা দিন যমে-মানুষে টানাটানি চলল; অনেকখানি অক্সিজেন বুকে পুরে শমীক তার জীবনী শক্তি ফিরে পেল। মেডিকেল কলেজের শিশুজন্মের ইতিহাসে শমীক এক বিরল দৃষ্টান্ত।

শমীক তার বন্ধুদের বলে, তোমরা জন্মেছ আঁতুড়ঘরে, আমি জন্মেছি ক্রাইসিসের মধ্যে; সর্বনাশ দিয়েই আমার শুরু।

শমীকের জন্মের সময় তার বাবা দেবপ্রসাদ কলকাতাতেই ছিলেন না। তিনি ছিলেন দিল্লিতে। দেবপ্রসাদ তখনকার দিনের বড় সরকারী কর্মচারী। স্বাধীনতা লাভের সেই দিনগুলিতে, সরকারী ব্যস্ততা হুড়োহুড়ির সময় ভদ্রলোক ঝুড়ি ঝুড়ি কাগজপত্র নিয়ে ওপরঅলাদের সঙ্গে দিল্লি ছোটাছুটি করছিলেন। কলকাতায় বাড়িতে কী ঘটে যাচ্ছে এটা তাঁর অগোচরে ছিল। দেবপ্রসাদকে এ-জন্যে ততটা দোষ দেওয়া যায় না। তাঁর কাজের গুরুত্ব বাদ দিলেও অন্য একটা কথা থেকে যায়। মোটামুটি নির্দিষ্ট সময়ের কিছু আগেই যে শমীক এ সংসারে চলে আসবে তা তাঁর জানা ছিল না।

দেবপ্রসাদ না থাকলেও ব্যাপারটা সামাল দেবার জন্যে ছিলেন চারুপ্রসাদ, শমীকের কাকা। আর ছিলেন ললিতমোহন, শমীকের মামা, ডাক্তার মানুষ। এই দুটি মানুষের কয়েক দিনের

ক্ষুধাতৃষ্ণা হরণ করে শমীক যখন শেষ পর্যন্ত প্রদীপের পলকা শিখার মতন বেঁচে উঠল ততদিনে দেবপ্রসাদ কলকাতায় ফিরেছেন। হাসপাতাল থেকে দিন কুড়ি-বাইশ পরে দেবপ্রসাদ স্ত্রীপুত্রকে বাড়িতে নিয়ে এলেন যদিও তবু ছেলের আয়ু সম্পর্কে তিনি বেশ কিছুদিন নিশ্চিন্ত হতে পারেন নি।

নিজের জন্মের সময়ক্ষণ, কোন্ অবস্থায় কেমন করে তার আবির্ভাব—এসব গল্প বাড়ির লোকের মুখে শুনতে শুনতে একদিন শমীক আবিষ্কার করে ফেলল, সে ক্ষণজন্মা পুরুষ। তখন তার বয়েস হয়ে গিয়েছে, মগজ নিজের মতন কাজ করতে শুরু করেছে।

শমীক সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা করার আগে তার পারিবারিক ইতিহাস অল্পস্বল্প জানা দরকার। ওরা মধ্য কলকাতার মানুষ। শমীকের ঠাকুরদার বাবা—অর্থাৎ তার প্রপিতামহ কৃষ্ণনগরের দিক থেকে ভাগ্যান্বেষণের জন্যে কলকাতায় এসেছিলেন। পেশকারী বৃত্তিতে অল্প দিনেই তাঁর পটুতা জন্মায়। এই উদ্যোগী পুরুষের ওপর লক্ষ্মী সদয়া হয়ে ওঠেন অচিরাৎ। পেশকারীর পয়সায় তিনি কলকাতায় ঘরবাড়ি করেন। শমীকের ঠাকুরদা ছিলেন আরও উদ্যোগী। তখন কলকাতায় ধর্মতলা স্ট্রীটের প্রচণ্ড হাঁকডাক। ভদ্রলোক ধর্মতলায় বিশাল এক দোকান দিলেন, সাইনবোর্ডের মাথায় লেখা থাকল ঃ 'ক্যালকাটা স্টোর্স ঃ ওয়াইন মার্চেন্ট।' শোনা যায়, তখনকার কলকাতায় লাটবাড়ির খানাপিনাতেও যাদের মদ্য সরবরাহ করার অধিকার ছিল শমীকের ঠাকুরদার ক্যালকাটা স্টোর্স তার অন্যতম। 'বাই অ্যাপয়ন্টমেন্ট অফ্ হিজ ম্যাজেস্টিস সার্ভিস'-এর তকমা ছিল তাঁর।

ঠাকুরদার দুই স্ত্রী। প্রথমা স্ত্রী নীরবালা যক্ষ্মারোগে মারা যান। তিনি নাকি অসামান্যা সুন্দরী ছিলেন। দ্বিতীয়া স্ত্রীর নাম মনোরমা। তিনি শেষের দিকে উন্মাদ হয়ে পড়েছিলেন। দুই স্ত্রীর জন্যে ঠাকুরদা কোথাও কোনো কৃপণতা করেন নি, বসনে-ভূষণে নয়, ঝিদাসীতে নয়, চিকিৎসার জন্যেও নয়। তবু দুই স্ত্রীই মনঃকষ্ট নিয়ে বিগত হয়েছেন। ঠাকুরদা তাঁর সেকালের বনেদি-আনার সমস্ত আদব বজায় রেখেছিলেন। পাথুরেঘাটায় তাঁর এক উপপত্নী ছিল। যৌবনকালে এই ব্যাপারে তিনি এত বেশী আসক্ত ছিলেন যে, নীরবালাকে নিত্যই আঁখিনীরে ভাসাতেন। বেচারী নীরবালা স্বামী-সঙ্গসুখে বঞ্চিত হয়ে শারীরিক ও মানসিক ক্ষয়রোগের কবলে পড়েন, যক্ষ্মায় ধরে। ওষুধে-বিষুধে কিছুই হল না। নীরবালাকে পুরী-দেওঘরে রেখে হাওয়া-বদল করানো হল। নীরবালার দিন তখন ঘনিয়ে আসছে; বাড়াবাড়ি অবস্থা। কলকাতার বাড়িতে যাগযজ্ঞ চলল সপ্তাহখানেক ধরে, তবু তিনি চলে গেলেন। শমীকের ঠাকুরদা স্ত্রীর স্বর্গের পথ প্রশস্ত করতে শাস্ত্রমতে ষোড়শোপচারে শ্রাদ্ধকর্ম করালেন, এবং নীরবালার একটা ছবি বড় করে বাঁধিয়ে নিজের ঘরে রেখে দিলেন।

দ্বিতীয়া স্ত্রী মনোরমার বেলায় বলা যায়—তিনি নীরবালার তুলনায় স্বামীগৃহে বেশীদিন কাটাতে পেরেছেন, স্বামীসঙ্গও অধিক পেয়েছেন। কিন্তু কাঁটার মতন তাঁর মনেও সেই একই অশান্তি বরাবর বিঁধে ছিল। স্বামী তখন আর পাথুরেঘাটায় যান না, সুরী লেনে রক্ষিতা রেখেছেন। মনোরমার উন্মাদ হয়ে যাবার পিছনে হয়ত আরও কোনো কোনো কারণ ছিল। তার মধ্যে একটা কারণ—তাঁর রাগ, জেদ, অহংকারের বাড়াবাড়ি। যে মানুষ তুচ্ছ কারণে

বিশ-পঁচিশটা ফরাসডাঙ্গার অমন মিহি দামী শাড়ি উনুনের ওপর টান মেরে ফেলে দিয়ে আসতে পারেন, রাশি রাশি কাঁসার বাসন দোতলা থেকে ছুঁড়ে ছুঁড়ে নীচে ফেলে ঝনঝন করে ভাঙতেও যাঁর বাধে না—তাঁর উন্মাদ হয়ে যাওয়া আশ্চর্য কি! মনোরমা যখন মারা যান শমীকের ঠাকুরদার বয়েস তখন পঞ্চাশ ছাড়িয়ে গিয়েছে। বছর ছয় আরও বেঁচে ছিলেন তিনি। সন্ন্যাস রোগে হঠাৎ একদিন মারা যান ভদ্রলোক।

শমীকের বাবা দেবপ্রসাদ নীরবালার সন্তান। চারুপ্রসাদ মনোরমার। শমীকের এক পিসীও আছেন, গৌরীপিসী, চারুপ্রসাদের ছোট। শমীক তার ঠাকুরদাকে দেখে নি। সে তার মা-বাবার জ্যেষ্ঠ সন্তান নয়, তার মাথার ওপর আরও দুজন ছিল, একজন আঁতুড়ঘরেই মারা যায়, পরের জন অবশ্য আজও জীবিত, শমীকের দিদি শচী। দিদির জন্মের অনেক পরে শমীক এসেছে। বছর দশ পরে। দেবপ্রসাদের সামান্য বেশী বয়েসের সন্তান শমীক। আশালতার শরীর-স্বাস্থ্যও যখন ভাঙতে শুরু করেছে তখন শমীক তাঁর পেটে আসে। মনে মনে ভয় ছিল আশালতার, এতকাল পরে সন্তান পেটে এসেছে, নির্বিঘ্নে সমস্ত মিটে যাবে কিনা কে বলতে পারে। দেবপ্রসাদ নিজেও চিন্তিত ছিলেন। কিন্তু তাঁর এবং তাঁর স্ত্রী আশালতার মনে মনে একটি পুত্রের সাধ ছিল। ভগবান অবশ্য সে সাধ শেষ পর্যন্ত পূর্ণ করলেন।

শমীক তার ঠাকুরদাকে চোখে দেখে নি; ছবি দেখেছে। নীচে তার কাকার যেটা কাজকর্মের ঘর, যে-ঘরে কাকার মক্কেলরা সন্ধে থেকে ভিড় করে বসে থাকে—সেই ঘরের দেওয়ালে ঠাকুরদার মস্ত একটা ছবি রয়েছে। অয়েল পেইন্টিং। একেবারে ধূসর হয়ে গেছে ছবিটা। ধুলো জমেছে পুরু হয়ে, রঙ ফিকে হয়ে যাচ্ছে দিন দিন। মানুষের যা যা দেখার দরকার করে ঠাকুরদার ছবিতে তার প্রায় সবই আছে—চোখ, মুখ, কান—শরীরের বারো আনা অংশই। চৌকোনো মুখ, মাথায় তেমন একটা চুল নেই, পাতলা চুল, চোখ ছোট এবং গোল গোল, নাক মোটা, ভারী চোয়াল, দাড়ি আছে, ঠোঁট চোখে পড়ে না। ঠাকুরদার গায়ে গলাবন্ধ কোট, বুকপকেটের কাছে ঘড়ির চেন দেখা যাচ্ছে, হাতে বাহারী ছড়ি। শমীক বেশ লক্ষ্য করে ছবিটা দেখেছে অনেকবার। তার মনে হয়েছে, প্রচণ্ড বৈষয়িক বুদ্ধি, আত্মপ্রসাদ এবং খানিকটা অহঙ্কার ছাড়া ঠাকুরদার চেহারায় কিছু নেই। সর্বত্রই একটা স্থূলতা এবং ভোগের চিহ্ন স্পষ্ট।

ওই ছবি দেখতে দেখতেই শমীক একদিন তার কাকা চারু প্রসাদকেই বলেছিল, "তোমাদের ওই বাবা ভদ্রলোকের নাম কেমন করে ঈশ্বর দাস হয়েছিল আমি বুঝতে পারি না। ঈশ্বরের যে দাস তার ওই চেহারা!"

চারুপ্রসাদ ভাইপোকে চিনতেন। দুঃখের বিষয়, কী কারণে যেন বরাবর বেশী রকম প্রশ্রয়ও দিয়ে এসেছেন। রাগ না করে বললেন, "ছবি দেখে মানুষ চেনা যায় না। তা ছাড়া নাম নামই। তোর নাম শমীক কেন?"

শমীক কাকার কথা শুনে হেসে মরে। বলল, "নামটা তো তুমিই দিয়েছিলে শুনেছি।"

"তোর বাবা দিতে বলল। আমাদের শচীর সঙ্গে মিলিয়ে শচীন দিতে যাচ্ছিলাম, ভাবলাম দুটোই শচীন-শচী হয়ে যাবে, তাই শমীক দিয়ে দিলাম। মানেটানে কি খুঁজতে গিয়েছি।"

শমীক বলল, "আমার নাম শমীকই হত, তুমি নিমিত্তমাত্র। মহাভারত পড়েছ তো! মহারাজ

পরীক্ষিত যার গলায় মরা সাপ ঝুলিয়ে দিয়ে গিয়েছিল সেই ঋষির নাম শমীক। আমি এখনকার শমীক, গলায় নাড়ি জড়িয়ে জন্মেছি। দেখো না, কী একটা কাণ্ড করি।"

চারুপ্রসাদ ঠাট্টার গলায় বললেন, "মহাভারতের শমীক কোনো কাণ্ড করে নি রে, করেছিল তার ছেলে। শমীক মুনি পরীক্ষিতকে ক্ষমাই করেছিল। ছেলে করে নি।"

শমীক বলল, "আমি কিন্তু করব না। কাণ্ড একটা করবই।"

চারুপ্রসাদ হাসতে হাসতে বলেছিলেন, "তোর কাণ্ড দেখেই যে মরব—তা জানি। যা, আর জ্বালাস না।"

শমীকের পারিবারিক ইতিহাসের যেটুকু জানা গেল তাতে অতীতের অংশটাই বেশী। বিগত দু পুরুষের কথা বাদ দিলে বাকি যে দু পুরুষ রয়েছে সেখানে শমীকের বাবা, কাকা আর শমীকরা। দেবপ্রসাদ আর চারুপ্রসাদ যদিও বৈমাত্র ভাই তবু কোনো দিনই সেটা স্পষ্ট করে বোঝা গেল না। বোঝা গেল না, কারণ নীরবালা যাকে মাতৃহীন রেখে গিয়েছিলেন, বছর চারেক বয়স থেকে মনোরমা তাকে নিজ সন্তানের মতন করে মানুষ করেছিলেন। চারুপ্রসাদ মনোরমার কোলে এসেছেন আরও বছর দুয়েক পরে। স্বামীগৃহে পা দিয়েই যাকে তিনি গ্রহণ করেছিলেন তাকে আর প্রত্যাখ্যান করেন নি। নিজের দুই সন্তানের—চারুপ্রসাদ আর গৌরীর—সমান করেই দেখেছেন দেবপ্রসাদকে। ঈশ্বরদাস অন্তত এই একটি জায়গায় অতিমাত্রায় দুর্বল ও শক্ত ছিলেন। দেবপ্রসাদকে কোনো সময়েই অনাদর সহ্য করতে হয় নি; মনোরমা জানতেন, স্বামী সেটা সহ্য করবেন না। তিনি নিজেও সে-চিন্তা কখনো করেন নি।

দেবপ্রসাদ এবং চারুপ্রসাদ তাই আজও সেই আজন্মের বাড়িতে একই সঙ্গে থেকে গেলেন। একান্নবর্তী পরিবারের অংশ হয়ে। দেবপ্রসাদের দুই সন্তান, শচী আর শমীক। শচীর বিয়ে হয়ে গেছে কোন কালে, এখন তার বয়েস প্রায় চল্লিশ হতে চলল। চারুপ্রসাদের তিন সন্তান, বড়টি ছেলে, ছোট দুটি মেয়ে। ছেলে শমীকের চেয়েও বয়েসে বড়, নাম অমৃত, মেয়ে দুটির মধ্যে বড়টি—পুরবীর বিয়ে হয়ে গিয়েছে বছর চারেক হল, ছোটটি শমীকের শিষ্যা হয়ে পড়েছে অনেকদিন ধরেই। শমীক তার মাথায় বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় জ্ঞানের শস্য ছড়িয়ে দিচ্ছে।

দেবপ্রসাদ এখন প্রবীণত্বের সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছেন। তাঁকে বৃদ্ধই বলা যায়। সরকারী চাকরি থেকে বিদায় নিয়েছেন অনেকদিন। চারুপ্রসাদ দাদার তুলনায় কম বৃদ্ধ। তাঁকে হয়ত প্রবীণই বলা চলে। ওকালতিতে অবসর বলে কিছু নেই—চারুপ্রসাদ তাই নিশ্চিন্ত।

দেবপ্রসাদের স্ত্রী আশালতা ইদানীং শ্বাসকষ্টে ভুগছেন। কেন যে এই কষ্ট তিনি জানেন না, বুঝতে পারেন না। কখনো কখনো তাঁর মনে হয় শমীকের জন্মসময় থেকেই তাঁর স্বাস্থ্য ক্রমশ ভেঙে যেতে যেতে এই রোগটা একসময়ে দেখা দেয়। তখন বছরে দু-একবার আসত যেত, অতটা বুঝতে পারতেন না। আজ সাতাশ-আঠাশ বছরে সেটা ধাপে ধাপে বাড়তে বাড়তে এখন পাকাপাকিভাবে ধরেছে। আশালতাকে মাঝে মাঝেই শয্যাশায়ী থাকতে হয়। সংসার চলে ছোট জা ইন্দুর দেখাশোনায়। ইন্দু বা ইন্দুলেখাও ইদানীং আশালতাকে বলেন, 'দিদি, আমারও আজকাল বুকের মধ্যে কেমন যেন করে। এক একদিন রাত্তিরে ঘুম ভেঙে যায়।' আশালতা

ধমক দিয়ে বলেন, 'চুপ কর, সেদিনকার ছুঁড়ি, তোর আবার বুকে ব্যথা। অম্বলটম্বল হচ্ছে তোর, একটু করে সোডা খেয়ে দেখিস, সব সেরে যাবে।'

ইন্দুলেখা হেসে মরেন। তিনি নাকি সেদিনকার ছুঁড়ি! দেখতে দেখতে বয়েস যে হেলে পড়ল—দিদি সেটা দেখেও দেখবে না। ইন্দুলেখা ভাশুরঝির বিয়ে দিয়েছেন, নিজের বড় মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন, মাথায় কাপড় তুলে সারাক্ষণ থাকতে হয়—তবু তিনি নাকি ছুঁড়ি!

অবশ্য এ-বাড়ির এই ভাষা। শ্বশুর-শাশুড়ীর দৌলতে সেকেলে ভাষার সবটাই তাঁদের ধাতস্ত হয়ে গিয়েছিল, হালফিল ছেলেমেয়েদের রাগারাগির জন্যে তার অনেক কথাই জিবের ডগায় এসেও আবার গলায় ফিরে যায়। অনেক সময় যায়ও না, যেতে দিতে মনও চায় না। ছেলেমেয়েদের সঙ্গে ঝগড়ার গলা করে বলেন, "তোরা থাম, আমাদের মুখ আমাদের, তোদের নাকি? আমরা যা শিখেছি বলব, তোরা আর শিক্ষা দিতে আসিস না। তোদের কালে কতই দেখছি....।"

শমীক হেসে হেসে বলে, "কাকি, বাবা এখনও ওয়েলিংটন স্কোয়ারকে বলবে গোলপুকুর, কাকা নীলরতনকে বলবে ক্যাম্বেল হাসপাতাল, মা বলে খেলুম গেলুম, তুমি বরাবর হাঁসপাতাল আর রিশ্‌কা বলে চালিয়ে গেলে। এসব অচল পয়সা আর চলবে না।"

ইন্দুলেখা বলেন, "আমরাই তো তোদের কাছে অচল হয়ে গেলুম রে। আমাদের ফেলে দে, আর কি!"

শমীক জিব কেটে শব্দ করে; বলে, "ছি ছি, ফেলব কেন, তোমাদের একপাশে ভাঙা চেয়ারে বসিয়ে রাখব।"

"আর তোরা মুখপোড়ারা সব ভাঙবি?"

"আমরা মানে আমি, আমায় বলতে পার। আমি সত্যি-সত্যিই সব ভাঙব। ভাঙার জন্যে আমার জন্ম।"

শমীকের শিষ্যা করবী হেসে বলল, "ছোড়দা, আমাকে নিবি না, তোর ভাঙা জিনিস কুড়োবে কে?"

ইন্দুলেখা নকল ধমক দিয়ে বললেন, "যেমন গোঁসাই তার তেমন গুপি—আছিস বেশ।" সকলেই হেসে উঠল একসঙ্গে।

শমীক যে সত্যি-সত্যিই ভাঙার জন্যে জন্মেছে বাড়ির লোক তা বিশ্বাস করত না। তেমন কোনো স্পষ্ট লক্ষণও চোখে পড়ে নি। দু-দশটা সাজানো-গোছানো কথা বললেই লোকে কালাপাহাড় হয় না। শমীকের স্বভাবে ও-রকম কিছু দেখা যেত না। বাড়ির লোক জানত ছেলেটা খানিকটা খেয়ালী ধরনের, খানিকটা বা জেদী; মাথায় ঝোঁক চাপলে অবাক অবাক কাণ্ড করে, হয়ত কখনো কখনো বাড়াবাড়ি কিছু করে ফেলে। বাড়িতে নানা তরফের প্রশ্রয় তাকে যে খানিকটা অকালপক্ক করে তুলেছে তাও স্বীকার করা যায়, কিন্তু সে কালাপাহাড় হয়ে উঠবে—একথা বিশ্বাস করা যায় না।

শমীকের বন্ধুরাও তাকে ভাল করে চিনত। জানত, শমীক কথা বলার একটা ঢঙ তৈরী করে নিয়েছে। তার কথার মধ্যে ধ্বনির প্রাবল্য যত অর্থের গভীরতা তত নেই। সে খানিকটা